International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 56-68
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

ভারতের অবহেলিত, দলিত, অস্পৃশ্য, অবদমিত, অচ্ছুৎ এবং নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা: একটি বিশ্লেষণ

অরূপ কুমার হালদার
এম. এ., প্রাক্তন ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The caste system that has been maintained in India from ancient times to the present time. One of the main reasons for this is the introduction of the caste system of traditional Hindu religion. This practice was basically divided into four classes namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Among these, the Shudras used to engage in physical work and serve the above three classes. But even if they were not considered unclean, they were subject to social discrimination. Apart from these four classes mentioned in the Varnashrama, there are many other classes of people in India who have been engaged in various service activities of the society from ancient times to the present day. They are Dalits or untouchables. But they have been deprived, neglected and oppressed by the upper castes since ancient times, from education, social status, self-respect and even the right to practice their religion freely. As a result, their social, economic, political and psychological progress is being hampered. For all these reasons, many social reformers and state thinkers have come forward to establish social justice. Among Mahatma Jyotiba Phule, E.V.Ramasamy (Periyar) and Babasaheb Ambedkar are notable. They were concerned with how to establish a just society by eradicating the stigmatized chapter of the Hindu caste system in their lifelong zealous efforts. That is why they felt the need to increase social unity and awareness, spread universal education, burn caste-based manuscripts in various social events and establish equality, justice, fraternity and equal rights for all by eliminating inequality among people of all races in the country wrote a secular constitution. Through which the centuries-old stigmatized caste system will come to an end and it will be possible to build a society free from discrimination and exploitation. This will establish a social justice in the future.

But its full development has not been possible yet due to lack of universal education, lack of morality and social awareness. As a result, judging from the overall point of view, the educational, social, cultural, economic and political system of this backward class has improved a bit, but it has not been possible at all. As a result, there is a growing tendency among the people of this Dalit community to abandon Hinduism and convert to other religions in order to escape the exploitation of the upper castes and to protect their self-

esteem. As a result, the social balance is being disturbed. And creating chaos in society. But it is hoped that in the future, if universal education, morality and social awareness are spread in the society, a just society will be established. Through this article, I have just made an analysis of how social justice will be established for the neglected, dalits, untouchable, depressed, unclean and oppressed people of India and their current condition.

Key Words: Neglected, Dalits, Untouchable, Depressed, Unclean and Oppressed, Caste System, Varnashrama, Discrimination, Exploitation, Social Justice.

ভূমিকা: আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ মহান দেশ হিসেবে পরিচিত। কারণ এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও নানা মতের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন জাতপাত ব্যবস্থার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যা প্রাচীনকালে বিশেষত সনাতন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তথা ঋগবেদে উল্লেখিত 'পুরুষসূক্ত', 'মনুস্মৃতি' এবং 'চতুরাশ্রম' প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। যেটা সমাজকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। এবং সেটাই বর্তমান সমাজে জাত ব্যবস্থা বজায় থাকার মূল কারণ। এই ব্যবস্থা ঈশ্বরের দৈববাণী বা ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্দেশেই সৃষ্টি হয়েছে এবং জন্ম অনুসারে কর্মের বিভাজকে অনুসরণ করেছে বলে মনে করা হলেও। এই জাত ব্যবস্থা যে কর্মের তাগিদেই মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার 'মনুস্মৃতি'তে বর্ণঅনুসারে কর্ম বন্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজে যারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, পূজার্চনা, শাস্ত্রচর্চা এবং সংগীতচর্চা নিয়ে আলোচনা করত তারাই ব্রাহ্মণ শ্রেণী, যারা দেশের সুরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত থাকতেন তাদের ক্ষত্রিয় শ্রেণী, যারা দেশের বা সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বানিজ্যের কাজে নিয়োজিত থাকতেন তাদের বৈশ্য শ্রেণী এবং সর্বশেষ যারা সর্বদা শারীরিক পরিশ্রম করে উপরের তিনটি শ্রেণী বা সমাজের বিভিন্ন রকম সেবার কাজে নিয়োজিত থাকতেন তারাই শূদ্র শ্রেণী বলে চিহ্নিত ছিলেন। কিন্তু তারা অচ্ছুৎ বলে গণ্য না হলেও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হতো। এদের পাশাপাশি 'বর্ণাশ্রমে' উল্লেখিত এই চারটি শ্রেণীর বাইরেও আমাদের ভারতবর্ষে এমন অনেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষাদিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও আত্মসম্মান এমনকি স্বাধীনভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকার থেকেও উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত হয়ে আসছে। কিন্তু তারাই যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সেবামূলক বা সামাজিক অগ্রগতির কাজে যুক্ত থেকেছে। এবং সমাজে অচ্ছুৎ, নিম্ন-অস্পৃশ্য 'দলিত জাতি' হিসেবে পরিচিত হয়েছে। যার অর্থ 'ভাঙ্গা বা চূর্ণ' অর্থাৎ নিম্ন-নিকৃষ্ট জাতি। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন যুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা বুদ্ধি-বিদ্যা, ক্ষত্রিয়রা শক্তি ও শাসনের জোরে এবং বৈশ্যরা অর্থের জোরে সমাজের সকল শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল। যেমন জন্ম অনুসারে কর্মের তথা জাতির বিভাজন সমাজের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কারন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেও কেবলমাত্র সম্পদ, বুদ্ধি-বিদ্যা ও শক্তির উপর ভিত্তি করে উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উপর অত্যাচার একটা অমানবিক কাজ বলা যেতে পারে। এর ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এই অবদমিত, বঞ্চিত, অবহেলিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজের মূল স্রোতে আসতে পারছে না। ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র অচ্ছুৎ বা নিম্ন-অস্পৃশ্য, অবহেলিত জাতি বলে। ফলে আজীবন তাদের সামাজিক সেবাই করে যেতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র 'গীতা'র বাণী হিসেবে 'কর্ম করে যাও ফলের

আশা করো না'। উক্তিটি উল্লেখ করলাম জানিনা কতটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেক্ষ তীব্র জাতিভেদ প্রথা না থাকলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ তথা সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার জন্য 'দলিত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। যার অর্থ ভাঙ্গা বা চূর্ণ অর্থাৎ নিম্ন-নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে। পরবর্তী সময়ে জাতির জনক গান্ধীজি এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে 'হরিজন' বা ঈশ্বরের সন্তান বলে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যদিকে আমাদের সংবিধানের প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর এই সম্প্রদায় কে 'অস্পৃশ্য', অবদমিত শ্রেণী এবং সিডিউল কাস্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষাদিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হলেও এখনো তারা সমাজের নিম্নস্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ করে চলেছে। এরা মূলত শহর এলাকার হাটে-বাজারে, শ্মশানে, হাসপাতালে, বিভিন্ন কল-কারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত এবং কৃষি জমিতে নানান সেবামূলক কাজে নিযুক্ত। এবং এই দলিত সম্প্রদায় মূলত মুচি, মেথর, ডোম, বাল্মিকী, ভূমিজ, নায়েক, পাহান, ভূঁইয়া, বাউরি, নুনিয়া, হাড়ি, বাগতি, মাহাতো, বিন প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করে থাকেন।

আমাদের ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দু ধর্মের 'বর্ণাশ্রম' প্রথার ফলে প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য রয়েছে। এর ফলে 'দলিত' শ্রেণীর মানুষ সর্বদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা পশ্চিমী রাষ্ট্রের ক্রীতদাসের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলনা। এই সমস্ত কারণে তাদের মধ্যে এই সামাজিক মর্যাদার, সামাজিক স্বীকৃতি এবং ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সংস্কারক তথা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এগিয়ে এসেছেন যার মধ্যে আমরা মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, পেরিয়ার এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর এর চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কি ধরনের জাতি বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটাও আলোচনার বিষয়।

প্রথমেই আমরা সামাজিক সংস্কার এবং ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে **মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে** এর সামাজিক সাম্য তথা ন্যায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তিনি ১৮২৭ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনে শহরের এক শূদ্র জাতির অন্তর্গত 'মালি' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি খুব সহজেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্র তথা অস্পৃশ্য নিম্ন-জাতির মানুষের সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন এবং বঞ্চনাকে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি হিন্দু 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থার অধ্যায়ন করে জানতে পেরেছিলেন যে সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, যুগেরপর যুগ ধরে ধর্মের ভয় দেখিয়ে এক শ্রেণীর মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিরক্ষর, দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। অর্থাৎ এক প্রকার ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছেন। সেই কারণে তিনি মনে করেছিলেন কেবল অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই শতাব্দীপ্রাচীন 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থার অন্ধবিশ্বাসকে দূর করা সম্ভব। এই নিম্নজাতি কে চিহ্নিত করার জন্য তিনি প্রথম 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এই শব্দটি বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে ভারতের বিভিন্ন ভাষা, রাজনীতি এবং ইংরেজি ভাষাতেও এর প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নিম্নজাতি বা দলিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য তথা তাদের জ্ঞান, নৈতিকতা, সমৃদ্ধি এবং দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষার সম্প্রসারণ। এই উপলক্ষে তিনি ও তাঁর স্ত্রী

সাবিত্রীবাই এর সহযোগিতায় ১৮৪৮ সালে দলিত শিশু ও মেয়েদের জন্য একটি স্কুল চালু করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গণশিক্ষা তথা সার্বজনীন শিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে বেশি আগ্রহী।.."Downtrodden sections are in urgent need of education in order to enrich them with wisdom, morality, progress and prosperity".. by Mahatma Phule.. এরপর তিনি ১৮৭৩ সালে অন্যান্য সামাজিক কর্মীর সহায়তায় 'সত্যশোধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সমাজে যুক্তিযুক্ত চিন্তার প্রসারের জন্য তিনি মূর্তিপূজার বিরোধিতা, 'বর্ণাশ্রম প্রথা'র সমালোচনা এবং পুরোহিততন্ত্রের অবসান এছাড়াও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উত্থান ও স্বাধীনতার জন্য অবিরাম কাজ করেছিলেন।

তিনি মনে করেছিলেন যে সমাজে জন্মগতভাবে সকল মানুষই সমান। অর্থাৎ ঈশ্বর যখন সকলকে সমান ভাবে তৈরি করেছে তাহলে কেবল জাতপাত, ধর্মমত এবং লিঙ্গগত কারণে কোন ব্যাক্তি অন্যের উপর অত্যাচার করার অধিকার নাই। সে কারণে তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা তৈরি 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং 'প্রার্থনা সমাজ' এর নিন্দা করে বলেছেন এগুলি দলিতদের প্রতারণা করে গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও তিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যেগুলি নিম্নবর্ণের শোষণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল।..'Discrimination between human beings on grounds of caste, creed or gender is a sin".. by Mahatma Phule.. তিনি স্বাধীন ও সাম্যের ভিত্তিতে ভারতীয় শোষণমূলক সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ছিলেন।

এরপর আমরা দক্ষিণ ভারতের সমাজ সংস্কার এবং ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে **পেরিয়ার** এর সামাজিক সাম্য তথা ন্যায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তিনি ১৮৭৯ সালে তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়েম্বাটুর শহরের এক নিম্নজাতি 'নাইডু' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সুবাদে সমাজে নিম্নজাতের মানুষদের সামাজিক বৈষম্যের ফলে কি ধরনের যন্ত্রণার শিকার হতে হয়, তা খুব কাছ থেকেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আবার ভারতীয় সমাজে প্রচলিত জাত ব্যবস্থার কারণে যে চিরস্থায়ী সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষদের, সেই জন্য তিনি মূর্তিপূজা ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর কে দায়ী করেছিলেন। এবং এই সামাজিক বৈষম্যের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি এই সামাজিক কু-প্রথা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' কৌশল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেখলেন তৎকালীন কেরালার 'ভাইকম' মন্দির এর নিকটবর্তী রাস্তা নিম্নজাতির মানুষের ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। এবং তাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেই কারণে 'ভাইকম সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করেছিলেন।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু সমাজে 'বর্ণাশ্রম প্রথা' ফলে সমাজের তিনটি শ্রেণী সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভ করলেও শূদ্র ও মহিলারা সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই কারণে গান্ধীজী হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি হিসাবে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' কে সমর্থন করলেও পেরিয়ার এই ব্যবস্থাকে সামাজিক বৈষম্যের কারণ হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সমস্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ তথা নিম্ন-শ্রেণীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তার মতে এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' সমাজে অস্পৃশ্যতা ও বাল্য বিবাহের মতো কুপ্রথার জন্ম দিয়েছিল। এবং সমাজের প্রত্যেক অব্রাহ্মণদের দাসে পরিণত করে অপমানজনক জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল।

১৯২৫ সালে তিনি সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আত্মসম্মান আন্দোলন' বা 'সেল্ফ রেস্পেক্ট মুভমেন্ট' চালু করেন। এই আন্দোলনে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে প্রচুর শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো সেখানে সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'কে প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর কিছু অংশকে বাদ দেওয়া হয়, যেগুলি অব্রাহ্মণদের ওপর আধিপত্য বা শোষণ নিরুদ্দেশে তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দু পৌরাণিক চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। যেমন দ্রাবিড় জাতি বাল্মিকীর রামায়ণে রাবণকে মহান নায়ক হিসেবে বর্ণনা করেছিল। অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য এই আন্দোলনের সদস্যদের এক অভিনব পদক্ষেপ ছিল জাতের বর্ণনা চিহ্নিতকারী নিজস্ব পদবী বাদ দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ। এই সমস্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি সামাজিক বৈষম্য দূর করে শোষনহীন সামাজিক সাম্য তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।

শেষ পর্যায়ে আমরা অস্পৃশ্য তথা বঞ্চিত শ্রেণীর রক্ষক এবং আমাদের সংবিধান নির্মাতা হিসেবে **বাবাসাহেব আম্বেদকর** এর সামাজিক সাম্য তথা ন্যায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তিনি ১৮৯১ সালে মহারাষ্ট্রের এক অস্পৃশ্য 'মাহার' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে সমাজে তথা শিক্ষা জীবনেও তাকে প্রবল অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্কুল জীবনে সামান্য জল পানের জন্য বৈষম্য। অর্থাৎ স্কুলে জল তেষ্টা পেলে এক অশিক্ষক কর্মী তাকে কিছুটা উপর থেকে জল দিতেন। আবার তিনি উপস্থিত না থাকলে সেইদিন তার তৃষ্ণা মিটত না। এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন সমাজ থেকে কুসংস্কার, বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতাকে দূর করে এক সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। যেখানে সকলেই সমান ও স্বাধীনভাবে নিজের জীবন যাপন করতে পারবে। এর পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ সালে বিদেশ থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফিরে তিনি অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সাউথবোরো কমিটি'তে যোগদান করে দলিত নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এরপর ১৯২৪ সালে ২০ জুলাই সামাজিক ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমাজের অস্পৃশ্য এবং অবহেলিত জাতির মানুষদের একত্রিত করে 'বহিষ্কৃতী হিতকারনী সভা' গড়ে তুলেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালের ১০ থেকে ১১ এপ্রিল নিপানিতে প্রাদেশিক মহাসম্মেলনের সভাপতিত্ব করে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধীর চিন্তার বিরোধিতা করে বলেন যে 'খাদি আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নিয়ে গান্ধী যতটা আগ্রহী, অস্পৃশ্যতা নিয়ে গান্ধী ততটা আন্তরিক নয়'।

আবার তাঁর স্কুল জীবনে জল বৈষম্যের কারণেই হয়তো 'জল ও এক জলাশয় থেকে সকলের জলপান' একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ইন্ধন জুগিয়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সম্মুখ ধারণা পাওয়া সম্ভব। সেই সময় মহারাষ্ট্রের কোলাবা (পুনা) জেলার মাহার শহরের এক জলাশয় বা কুঁয়ো থেকে সমাজের সকলের জল পান করার অনুমতি ছিল না। অর্থাৎ এই প্রকার সামাজিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্বে ওই শহরে ১৯২৭ সালের ২০ মার্চ অব্রাহ্মণ তথা অস্পৃশ্যদের নিয়ে একটি মহা সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে থানে, রত্নাগিরি, বোম্বাই ও কোলাবা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫০০০ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেছিল। এবং প্রধান বক্তা হিসেবে আম্বেদকর বক্তৃতা শেষে সকলকে নিয়ে তিনি মাহাদ শহরের 'চৌদার জলাশয়' থেকে জল পান করে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ও তার সমর্থকরা শতাব্দীপ্রাচীন বৈষম্যের প্রথা কে তুলে দিয়েছিলেন। এই অভিযানকে 'মাহাদ সত্যাগ্রহও' বলা হত। এছাড়াও এই সম্মেলনে বক্তাদের দ্বারা হিন্দুদের শতাব্দীপ্রাচীন

'মনুস্মৃতি'র এক কপি অবমাননা করে পড়ানো হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেই ১৯২৭ সালে 'অমরাবতী মন্দিরে' প্রবেশ আন্দোলন এবং ১৯২৯ সালে পুনার 'পার্বতী মন্দিরে' প্রবেশ আন্দোলনে আম্বেদকর বিশেষ ভূমিকা পালন না করলেও, ১৯৩০ সালে নাসিকের 'কালো রাম মন্দিরে' প্রবেশ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও আম্বেদকর বলতেন এই অস্পৃশ্যরা যেন হিন্দু উৎসবে উচ্চবর্ণদের কোনরূপ সহযোগিতা না করে। আবার হিন্দু 'খান্ডব' উৎসবে আম্বেদকর বলেন মন্দিরে মাথা ঠেকিয়েও ঈশ্বর অস্পৃশ্যদের কিছুই দেয়নি। পরিবর্তে সমাজের নোংরা পরিষ্কার এবং মৃত মাংস ছাড়া। এই কারণে তিনি সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে সরে এসে মানুষের সামাজিক ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আম্বেদকর মনে করেছিলেন এই অস্পৃশ্য বা অবদমিত শ্রেণীরা সমাজে নানা ভাগে বিভক্ত। তাদের একত্রিত করে ঐক্যের মনোভাব গড়ে তুলতে না পারলে সমাজে কোনদিনই সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে একান্ত প্রচেষ্টায় 'মুক নায়ক', বহিষ্কৃত ভারত' এবং' জনতা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং তিনি সারাজীবন লক্ষ, লক্ষ অবদমিত মানুষের ন্যায়বিচার, সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে তাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান বোধ প্রতিষ্ঠা না হলে কোনদিনই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে.."Self-respect is a most vital factor in life. Without it man is a mere cipher".. by B.R. Ambedkar.. এছাড়াও আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমেও উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও বৈষম্য কমাতে চেয়েছিলেন। যেমন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অধিকার এবং অন্য বর্ণের সঙ্গে বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে হিন্দু সমাজে সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ব্যাপক অর্থে পরিলক্ষিত এবং সমাজে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এর মূলে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন জাতবৈষম্য ব্যবস্থা যা 'বর্ণাশ্রম প্রথা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবং এই 'বর্ণাশ্রম' ছিল ব্রাহ্মণ ধর্মের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা। এর মাধ্যমে উচ্চজাতির স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতো এবং নিম্নজাতির মর্যাদাহানি ঘটতো। ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সকল ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এবং জাতির অগ্রগতি বিনষ্ট হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে.."Unless you change your social order you can achieve little by way of progress".. by B.R. Ambedkar.. সেই কারণে তিনি বৈপ্লবিক ভাবে যুক্তির মাধ্যমে এই জাতিগত প্রতিষ্ঠানকে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। আম্বেদকর হিন্দু সমাজের 'বর্ণাশ্রম প্রথা'র বিরোধিতা করে বলেন এখানে জন্ম অনুসারে কর্মের বিভাজন করা হয়েছে। কিন্তু মূল 'বেদে' এই বর্ণ বিভাজন প্রথা না থাকলেও পরবর্তীকালে 'মনুস্মৃতি' তথা 'পুরুষসূক্তে' সংযোজিত হয়। আবার 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ' থেকে জানা যায় আর্যসমাজে তিনটি বর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যা পরবর্তীকালে শ্রেণি সংঘাতের ফলে দুর্বল ক্ষত্রিয় শ্রেণীর একাংশ অনার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেবাদানকারী নিম্নশ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। এর অর্থ এই যে 'মনুস্মৃতি'র দ্বারাই সমাজে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, অচ্ছুৎ এবং অবিচারের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন সমাজে কর্মের বিভাজন জন্মগতভাবে নয়, গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার সামাজিক বৈষম্য থাকলেও তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা অর্থাৎ এখানে সামাজিক সাম্যের গুরুত্ব বেশি হলেও, তিনি একটা বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজে পিছিয়ে পড়া অবদমিত,

বঞ্চিত বা অস্পৃশ্য মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ও উন্নয়ন ছাড়া তাদের সামাজিক উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। সেই কারণে তিনি অস্পৃশ্য শ্রেণীর সাম্য এবং ঐক্যের বিষয়টির পাশাপাশি একাধিকবার তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর' দাবি তুলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এর মাধ্যমেই তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে 'কমিউনাল এওয়ার্ড' এর মধ্যে আম্বেদকরের অস্পৃশ্যদের 'স্বতন্ত্র নির্বাচন মণ্ডলীর' জন্য দীর্ঘদিনের দাবির স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এবিষয়ে গান্ধী ও আম্বেদকর এর মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। এবং শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর ১৯৩২ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পুনার কারাগারে গান্ধী ও আম্বেদকর এর মধ্যে 'পুনাচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এবং তিনি 'স্বতন্ত্র নির্বাচন মন্ডলীর' স্বপ্ন থেকে সরে এসে অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিকে গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে.."Political tyranny is nothing compared to social tyranny... A reformer who defies society, is much more courageous man than a politician who defies Government".. by B.R. Ambedkar..

তিনি এই জাতিভেদ তথা 'বর্ণাশ্রম প্রথা' কে অগ্রাহ্য করেছিলেন কারণ এর মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক হিংসা, সামাজিক বৈষম্য এবং বিভাজনের শিকার হতে হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের। এই কারণে তিনি চেয়েছিলেন এই পিছিয়ে শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক চেতনার ও ঐক্যের জাগরণ করতে। যাতে পর্যায়ক্রমে সেই চেতনার জাতীয়করণ ঘটবে। এসমস্ত কারণেই নাগপুরে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। যেখানে আম্বেদকর এর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি ছিল এইরকম যে 'উচ্চ জাতের হিন্দু কখনোই অস্পৃশ্যদের সমস্যা অনুধাবন করতে পারবে না, প্রতিকার তো দূরের কথা'। আবার আমরা যদি দেখি হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার দ্বারা সামাজিক বিভাজন থেকে তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং অস্পৃশ্য, অবদমিত মানুষদের উন্নতির জন্য ১৯৪৪ সালে কানপুরে 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' এর অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'জাতির স্বরাজ অপেক্ষা নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি আমার লক্ষ্য'। অর্থাৎ এখানেই বোঝা যাচ্ছে তিনি এমন এক গণতান্ত্রিক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন যেখানে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক হবে। অর্থাৎ তিনি ন্যায় সঙ্গত গণতান্ত্রিক আদর্শের একনিষ্ঠ পুজারি ছিলেন। এবং ভারতীয় সংবিধান রচয়িতা হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধিকার রক্ষার পথ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এক মানুষ একই সামাজিক মূল্য হওয়া দরকার, এখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গণতন্ত্র প্রসঙ্গে... "Democracy is not merely a form of Government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellowmen".. by B.R. Ambedkar..

এছাড়াও আম্বেদকর লক্ষ্য করেছিলেন যে সামাজিক অগ্রগতি তথা সামাজিক সংস্কার, ন্যায়বিচার এবং জাতির আত্ম-সম্মান প্রতিষ্ঠিত জন্য সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি জনগণের শিক্ষা তথা সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়ে সমাজের অস্পৃশ্য, দলিত অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সামাজিক অগ্রগতি বা মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি মহান সামাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজে সার্বজনীন শিক্ষার পাশাপাশি যদি উচ্চশিক্ষার সুবিধাগুলিও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সমাজে পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণ করা হয়। তাহলে অবশ্যই সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এবং জাতির উন্নয়ন সম্ভব হবে

ফলে সামাজিক অগ্রগতি ঘটবে, এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে। এ প্রসঙ্গে.."Untouchability shuts all doors of opportunities for betterment in life for untouchables. It does not offer an untouchable any opportunity to move freely in society; it compels him to live in in dungeons and seclusion; it prevents him from educating himself and following a profession of his choice".. by B.R. Ambedkar..

কিন্তু খুব দুঃখজনক বিষয় হলো শেষ জীবনে আম্বেদকর হিন্দু ধর্মের এই কলঙ্কিত জাতপাত ব্যবস্থার কারণেই বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং মৃত্যুর দু-মাস আগে অর্থাৎ হাজার ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর নাগপুরের এক ঐতিহাসিক ধর্মান্তর অনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং এবং প্রায় ৫ লক্ষ অনুগামী নিয়ে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

এরপর আমরা অস্পৃশ্য বা দলিত শ্রেণীর **বর্তমান অবস্থা** নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে প্রথমেই দেখব বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা এছাড়াও অন্যান্য রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় এখনো উচ্চ-নিচ, জাতপাত বৈষম্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বজায় রয়েছে। এযেন এক সামাজিক ব্যাধির মতো সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা থেকে রক্ষা করে ভবিষ্যতে ন্যায় ভিত্তিক, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্য ও সংরক্ষণ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় ভারতীয় নাগরিক এবং অনাগরিকদের জন্য সাম্যের অধিকার দেয়া হয়েছে। যেখানে সকলেই সমান বলে বিবেচিত হবে। একে মৌলিক অধিকার বা পুর অধিকার বলা হয়। ২৩(১) নং ধারায় মানুষ নিয়ে ব্যবসা করা, কাউকে বেগার খাটানো বা বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদান। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৪৬ নং ধারায় রাষ্ট্র যেকোনো ধরনের সামাজিক অবিচার, শোষণ থেকে তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীকে রক্ষা করবে। এবং তাদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হবে। ৩৩০ এবং ৩৩২ নং ধারায় অনুসারে দেশের লোকসভা এবং প্রত্যেক রাজ্য বিধানসভায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩৩৫ নং ধারায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কৃত্যক পদে প্রশাসনিক উৎকর্ষতা রক্ষার জন্য তপশিলি জাতি এবং উপজাতির দাবিগুলি বিবেচনা করা হবে। ৩৩৮ এবং ৩৩৮(ক) নং ধারায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আলাদা আলাদা কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩৯ নং ধারায় রাষ্ট্রপতি সংবিধান প্রবর্তনের ১০ বছর পরে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণের রিপোর্ট একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং অন্য তপশিলি এলাকার প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চাইতে পারে। এছাড়াও বর্তমানে অর্থাৎ ২৫ শে জানুয়ারি ২০২০ সালে ১০৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৩৪ সংশোধন করে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ ৭০ থেকে ৮০ বছর বাড়ানো হয়। এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য যে আসন সংরক্ষিত ছিল তাকে অপসারিত করা হয়।

কিন্তু এই সমস্ত সংরক্ষন সত্বেও বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো সম্পূর্ণরূপে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই কারণেই হয়তো আমরা প্রতিনিয়তই নিউজ পেপার বা খবর মাধ্যমগুলোতে দলিতদের উপর উচ্চজাতের মানুষের অত্যাচারের ঘটনা শুনতে পায়। এছাড়াও দলিত

মহিলাদের ধর্ষণ করে হত্যা আবার বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ কে কেন্দ্র করে বিবাদ ঘটনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এখনো শিক্ষা-সামাজিক নানান ক্ষেত্রে তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। এ যেন এক প্রকার সামাজিক ব্যাধি যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছে। অর্থাৎ দেশে স্বাধীনতার ৭৩ থেকে ৭৪ বছর পরও সমাজের সকল স্তর থেকে বৈষম্য তথা অস্পৃশ্যতা এখনো দূর করা সম্ভব হয়নি। ২০১১ সালে ভারতের জনগণনা অনুযায়ী এই দলিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ১৬.৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতীয় মোট জনসংখ্যার হিসেবে প্রায় ২০.১৪ কোটির কাছাকাছি। এক্ষেত্রে ভারতের উত্তরপ্রদেশের মোট তফসিলি জাতির ২০.৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ ১০.৭ শতাংশ, বিহার ৮.২ শতাংশ এবং তামিলনাড়ু ৭.২ শতাংশ দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় মিলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি হয়ে যাবে। আমরা যদি একটু পূর্বে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সমাজের ঋণাত্মক বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারি ক্ষেত্রে 'তপশিলি জাতি' বা 'সিডিউল কাস্ট' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন।

এক্ষেত্রে আমরা যদি ২০১৪ সালের পর থেকে আলোচনা করি তাহলে দেখব আগের তুলনায় ভারতে দলিত নির্যাতন ও বৈষম্যের পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬ সালে দলিতদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংখ্যায় অত্যাচারের খবর পাওয়া গেছে। প্রায় ২৫.৬ শতাংশ। এরমধ্যে বিহার ১৪ শতাংশ এবং রাজস্থান ২৬ শতাংশ। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাটেও অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ 'দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' রিপোর্ট অনুযায়ী বার্ষিক রেকর্ডে জাতীয় মামলায় গত এক দশকে দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ এবং অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে মাত্র ২.৫ শতাংশ। আবার ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ বছরে সাধারণভাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিমাণ প্রায় ৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়াও একই সময়ে ধর্ষণের ঘটনা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৯ সালে 'দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৩২ হাজার ৩৩ টি ধর্ষণের মামলা নিবন্ধিত হয়েছিল। যার মধ্যে ১১ শতাংশ ছিল দলিতের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ২০১৯ সালে ভারতে প্রতিদিন প্রায় ১০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে রাজস্থানে সর্বোচ্চ ৫৫৪, উত্তরপ্রদেশে ৫৩৭ এবং মধ্যপ্রদেশে ৫১০ টি ধর্ষণের মামলা হয়েছিল। আবার একটু অন্যভাবে বললে 'দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ধর্ষণের মোট সংখ্যাটি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে। তবে দলিত মহিলাদের ধর্ষণের পরিমাণ প্রায় ১৬০ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ ১৩৪৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৮৬ দাঁড়িয়েছে। গত ১০ বছরে দলিত নির্যাতন ভারতবর্ষে বেড়েছে প্রায় ৬৬ শতাংশ হয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতার ৭৩ থেকে ৭৪ বছর পরেও অর্থাৎ ২০১৯ সালের ২৫ শে অক্টোবর হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে বৈষম্যের ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে যেটা বর্তমান যুগের কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। 'উত্তরপ্রদেশের বলন্দর' জেলার একটি শহরে দলিত বাল্মিকী সম্প্রদায়ের মহিলারা 'হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ' করতে গেলে তাদেরকে বাধা দিয়ে কয়েকজন উচ্চজাতের যুবক মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ করে দেয়। তাদের মতে এখানে উচ্চবর্ণের লোকেরা পুজো দেয়, তারা নিম্নবর্ণের হওয়ায় তাদের পুজো দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আবার 'টাইমস অফ ইন্ডিয়ার' খবর অনুযায়ী ২০২০ সালে মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুরের এক পার্টিতে খাবারে হাত দেওয়ার অপরাধে দুজন উচ্চবর্ণের যুবক এক দলিত সম্প্রদায়ের ২৫ বছরের যুবককে

পিটিয়ে হত্যা করেন। এছাড়াও ২০১৮ সালে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় উচ্চবর্ণের লোকেদের পুজোর জন্য সাজানো দেবতার পবিত্র ডোলি ছুঁয়ে ফেলার অপরাধে এক দলিত যুবকের প্রতি শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও উচ্চ-নিচ এর বৈষম্য থেকে বেড়িয়ে সামাজিক সাম্য তথা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। অন্যদিকে মন্দিরে প্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর একটি অভিনব পদক্ষেপ আমাদের চোখে পড়ে। যেটা ভারতের ছত্রিশগড় রাজ্যের রায়পুর থেকে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে 'ছারপোরা' গ্রামের দলিত সম্প্রদায়ের ঘটনা। এই গ্রামের দলিত সম্প্রদায় হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে উচ্চ জাতের মানুষের দ্বারা নানা রকম বঞ্চনা ও অবমাননার শিকার হতে হতো। এমনকি তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার ও নামের পরিবর্তে 'চামার' বা অচ্ছুৎ বলে ডাকা হতো। এসমস্ত অবমাননার জন্যই তারা এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছিল। মন্দিরে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সারা শরীরে তথা মুখমন্ডলে খোদাই করে ঈশ্বরের মন্ত্র লেখা হতো। তাদের যুক্তি হলো ভগবান কেবলমাত্র মন্দিরেই নয়, মানুষের শরীরেও বাস করে। এই গ্রামের বৃদ্ধ ধানিরাম সোনওয়ানি কোথায় 'আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হতো, কাউকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হতো না'। আবার দুঃখ করে তিনি বলেন আমাদের 'মন্দিরে কি দরকার যখন আমাদের শরীরেই ভগবানের নাম লেখা' এই দলিতরা সাধারণত 'রামনামি' সমাজের অংশ। তাদের মতে দলিত ভক্ত পরশুরাম ভরদ্বাজ কে যখন মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি এই সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শরীরে বেদনাদায়ক উল্কি দ্বারা ঈশ্বরের নাম লেখার প্রথা আর খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। তাহলে এই সমস্ত বিষয় থেকেই বোঝা যায় সমাজে নিচু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে কতটা অবমাননার শিকার হতে হতো এবং বর্তমানেও হচ্ছে। এছাড়াও আরেকটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা যা গোটা দেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল এই সমাজের বর্বরোচিত চেহারা। অর্থাৎ একবিংশ শতকেও দলিতদের উপর সমাজের উচ্চজাতের মানুষদের অত্যাচারের চিত্র। ২০২০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশের 'হতরাশ' জেলার একটি খামারে ১৯ বছর বয়সী মেয়েকে চারজন উচ্চজাতের লোক গণধর্ষণ ও নরকীয় অত্যাচার করেছিল। এর ফলে দুই সপ্তাহ তিনি নিজের জীবনের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে দিল্লির এক হাসপাতালে মারা যান। এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হচ্ছে বর্তমানে দলিত শ্রেণীর সমজিক অবস্থা।

হিন্দু ধর্মের এই সমস্ত জাতপাত ব্যবস্থা এবং উচ্চবর্ণের নির্যাতন ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে বর্তমানে দলিতদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ একথা বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি দলিত সম্প্রদায় থেকে এসেছে। এই ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর শহরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২০১৫ সালে প্রায় ৫ লক্ষ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও ২০১৮ সালে গুজরাটের উনাও শহরে দলিত সম্প্রদায়ের প্রায় ৪ হাজার মানুষ 'আত্ম-সম্মান' রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে দলিতের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও ইসলামধর্ম গ্রহণের ঘটনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ২০১৯ সালে ২রা ডিসেম্বর তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাই শহরের নিকটবর্তী 'নাদুর' গ্রামে পাঁচিল ভেঙে দলিত সম্প্রদায়ের ১৭ জনের মৃত্যুর ঘটনা কে কেন্দ্র করে আইনী এবং জাতিগত বৈষম্যের কারণে সেই পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ৩০০০ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সমাজে উচ্চজাতের মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণের পাশাপাশি বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশংসাসূচক ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে। ২০১৬ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকার' খবর অনুযায়ী যখন ভারতবর্ষেরের কেরালা রাজ্যে 'সবরিমালা' মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিয়ে বিতর্কিত আইনি লড়াই চলছে। সেই বছরই এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উত্তরাখণ্ডের গেরওয়ালের জৌনসর বাওয়ার অঞ্চলের 'পরশুরাম' মন্দিরের কর্তৃপক্ষ। তারা মন্দিরের শতাব্দীপ্রাচীন ৪০০ বছরের পুরনো রীতি-নীতি বর্জন করে মন্দিরে মহিলা ও দলিতদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিয়েছিল। এছাড়াও ঘোষণা করা হয় এখন থেকে সকলের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। এই প্রসঙ্গে দলিত নেতা দৌলত কুঁয়ার বলেন যে 'টানা ১৩ বছর ধরে আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। পরশুরাম মন্দির কর্তৃপক্ষের পশুবলি বন্ধ করার সিদ্ধান্তকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি'। বর্তমান যুগে মন্দির কর্তৃপক্ষের এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ অবশ্যই সামাজিক সাম্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত ২৫-২৮ নং ধারায় উল্লেখিত সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্ম প্রচারের অধিকার রক্ষিত হয়েছে। অতএব আশা করা যায় এই পদক্ষেপের ফলে ভবিষ্যতে জাতপাত ব্যবস্থার অবসান হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে।

বর্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন ও একবিংশ শতাব্দী শুরু থেকে ভারতবর্ষে জাতপাতের নামে রাজনীতি এক অভিনব রূপ লাভ করেছে। এবং 'দলিত' শব্দটির রাজনৈতিক স্বার্থে প্রচলিত হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতপাত কেন্দ্রিক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের উপর কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে আবার অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই সামাজিক বৈষম্যকে কিছুটা জিইয়ে রাখছে। এবং ভোটে জেতার নতুন কৌশল হিসাবে তপশিলি জাতি, উপজাতি অর্থাৎ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামাজিক জাতভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করছে। যেমন জাতভিত্তিক জাতীয় দল হিসেবে উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর নেতৃত্বে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে গঠিত 'বহুজন সমাজ পার্টি' কথা বলা যেতে পারে।

এছাড়াও উন্নত গ্রাম বা শহর এলাকায় জাত ব্যবস্থার মতো আর এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যাকে আমি 'স্বাচ্ছন্দ্য জনিত বৈষম্য' বলে মনে করি। এক্ষেত্রে সমাজে কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত ব্যক্তিরা অন্যান্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হীন ব্যক্তিদের ওপর একটা পরোক্ষ বিভাজন গত বৈষম্য চালায়। যেমন সমাজের কোন অনুষ্ঠানে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া। এমনকি ওই স্বাচ্ছন্দ্য হীন ব্যক্তিরা উচ্চ শিক্ষিত হলেও তাদের কোন কথার মূল্য সেই সমাজে দেওয়া হয় না। এর ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছন্দ হীন ব্যক্তিদের মানসিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। এর জন্য দায়ী সার্বজনীন শিক্ষা ও নৈতিকতার অভাব।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, সনাতন হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমপ্রথার প্রভাবে প্রাচীনকাল থেকে উচ্চবর্ণের মানুষের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষেরা বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হতো। তা আজও অর্থাৎ স্বাধীনতার ৭৩ থেকে ৭৪ বছর পরে অনেকটা হ্রাস পেলেও, এখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শোষণ ও বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এই বঞ্চনা ও

শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাত ব্যবস্থার এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসানের জন্য আমাদের দেশে সামাজিক সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধান তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার এবং দারিদ্রতার অভাবে এখনো তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। ফলে সার্বিক দিক থেকে বিচার করলে বর্তমানে এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিছুটা উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই জাত ব্যবস্থার এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে তাদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র/সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী:

1. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার (সম্পাদক), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়, বসু, রাজশ্রী, ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, পৃষ্ঠা. ৫৩৬-৫৬২, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলকাতা- ৭০০০১৩, অক্টোবর, ২০১৩ সি।
2. চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদক), ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, দাস, সমীরকুমার, বি আর আম্বেদকরঃ দলিত-মুক্তি ও রাষ্ট্রগঠন, পৃষ্ঠা. ৩১৩-৩২৯, একুশে প্রকাশন, ৫৯ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৪, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই, ২০১৪।
3. চক্রবর্তী, রাধারমন (সম্পাদক), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, চক্রবর্তী, রাধারমন, ভীমরাও রামজী আম্বেদকরঃ দলিতের রাজনীতি, পৃষ্ঠা. ৬০৯-৬৪০, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, ২০০৯।
4. চৌধুরী, অলোকনারায়ণ, ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা, ভীমরাও রামজি আম্বেদকরঃ দলিত মুক্তি আন্দোলন, পৃষ্ঠা. ২৪১-২৫৪, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, জুলাই, ২০১১।
5. দাস, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনঃ অনুন্নত সম্প্রদায় ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে আম্বেদকর, পৃষ্ঠা. ৪৫০-৪৭৯, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, মে, ২০০৮।
6. মহাপাত্র, অনাদিকুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, ২৮/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০০১২, নভেম্বর, ১৯৯৮।
7. সরকার, কল্যাণকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস ১, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, ১০১বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, নভেম্বর, ২০০১।
8. Gauba, O.P, Indian Political Thought, Mahatma Jyotiba Phule, Babasaheb Ambedkar, Periyar: E.V.Ramaswami Naicker, p.145-163, Mayur Books, 4226/1, Ansari Road, DaryaGanj, New Delhi- 110002, 2015.
9. Chakrabarty, Bidyut and Pandey, Rajendra Kumar, Modern Indian Political Thought: Text and Context, Jyotiba Phule: Unique Socio-Political Ideas, p.16-19, B.R. Ambedkar, p. 76-102, SAGE Publications India Pvt. Ltd., B1/I-1, Mohan Cooperative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110044, India, 2009.

10. Roy, Himanshu and Singh, Mahendra Prasad (Ed.), Indian Political Thought: Themes and Thinkers, Jha, Nirajkumar, Jotirao Phule: Social Justice, p.170-193, Jha, Nirajkumar and Chouhan, A.P.S, Periyar: Radical liberalism, p.333-350, Singh, Mahendra Prasad, Ambedkar: Constitutionalism and State Structure, p.351-360, N.Sukumar, Ambedkar: Democracy and Economic Theory, p.361-392, Pearson Indian Education Service Pvt. Ltd., World Trade Tower, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India, 2017.
11. 'Half of India's Dalit Population lives in 4 States', Times of India. May 02, 2013.
12. 'Most Crimes Against Dalits Are Against SC Women: NCRB Data', The Wire Staff. Dec 01, 2017.
13. 'On An Average, India Reported 10 Cases Of Rape of Dalit Women Daily In 2019, NCRB Data Shows', News18.com. Oct 03, 2020.
14. 'Here we look at some of the brutal rape cases from Uttar Pradesh in recent years', India Today. March 02, 2021.
15. 'দলিত, নিম্নবর্ণ, জাঠ, পাতিদার, অসন্তোষ ছড়াচ্ছে দ্রুত', আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ১১, ২০১৮।
16. 'দলিত মহিলাদের মন্দিরে ঢুকতে বাধা উত্তরপ্রদেশের বলন্দশহরে', আজকাল, অক্টোবর ৩১, ২০১৯।
17. 'মন্দির থেকে বঞ্চিতঃ তাই মুখেই ইশ্বরের নাম খোদাই করেন দলিতরা', কলকাতা ২৪×৭ অনলাইন ডিক্স, জানুয়ারি ১৮, ২০১৭।
18. 'বৌদ্ধধর্মে দিক্ষিত হচ্ছে ভারতীয় দলিতরা', DW নিউজ India, ০৪.০৫.২০১৮।
19. 'প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ইসলামধর্ম গ্রহণের পথে ৩০০০ দলিত', অন ইন্ডিয়া বেঙ্গলী নিউজ, ডিসেম্বর ২৬, ২০১৯।
20. 'খাবারে হাত দেওয়ার অপরাধে পিটিয়ে খুন করা হল ২৫ বছরের দলিত যুবককে', নিউজ18 বাংলা, ডিসেম্বর ০৯, ২০২০।
21. '৪০০ বছরের রীতি ভেঙে মহিলা, দলিতদের প্রবেশাধিকার দিল উত্তরাখন্ডের মন্দির', আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ১৬, ২০১৬।
22. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, ২০৯বি বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৬, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।
23. আরও অন্যান্য..